দ্বিতীয় অধ্যায়

বরাক উপত্যকার কবিতাচর্চা

পাহাড়-নদী বেষ্টিত আশ্চর্য এক ভূমি এই বরাক উপত্যকা। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন রুচির উপাদান নিয়ে মানুষের অন্তর্মনকে করে রেখেছে জীবনমুখী। বরাকভূমির হাজারো সমস্যা, তবু জীবন থেমে নেই কোনও বাঁকের অন্ধকারে। সমস্যা কালো মেঘ ভেদ করে উঁকি মারে গানের গুনগুন আর কবিতার কণ্ঠস্বরের সূর্যালোক।

মেঘালয়, ত্রিপুরা মিজোরাম ও মণিপুরের অনাবিল সৌন্দর্য বেষ্টিত এই বরাক উপত্যকা, দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকা ঐতিহাসিক কারণেই বাঙালি অধ্যুষিত। কাছেই সীমান্ত এবং তারপরই বাংলাদেশ। এই অঞ্চলে কবিতাচর্চার ইতিহাস বেশ পুরনো। সঙ্গে রয়েছে ২১শে ফেব্রুয়ারির[১] ভাষা-সংগ্রামী ঐতিহ্য নিয়ে বলে যায় জয়ের গাথা।

শ্রীভূমি-শ্রীহট্ট বা কথিত ভাষায় যা সিলেট তা বরাক উপত্যকার এক জেলা— করিমগঞ্জ সহ সুরমা উপত্যকার অন্তর্ভুক্তি ছিল দেশভাগ ও স্বাধীনতার আগে। খণ্ডিত দেশ কেড়ে নিল শ্রীহট্ট বা সিলেটকে, যা আজ বাংলাদেশের রাষ্ট্রসীমার অন্তর্ভুক্ত। বরাক উপত্যকার সখীসত্তা হয়ে সিলেট আর থাকতে দেওয়া হলো না। সেসময় যে গণভোট[২] হয়েছিল, তাতে বহু লোককে ডি-ভোটার করে দেওয়া হয়। তারপরই ঘটে এই বিচ্ছেদ। রাজনৈতিক চক্রান্তে দেশভাগ হয়। এই বিভাজনে বহু চোখের জল ঝরেছিল মানুষের প্রীতিময়তার। সেই বিষাদচিহ্নের ওপর, বিষাদচিহ্নের সুগভীরে হয়তো রয়ে অজস্র কবিতার মরদেহ, আত্মঘাতী কবিতা। সুদীর্ঘ ক্ষতচিহ্ন আসলেই ক্ষতি করে যায় অনেক কিছু ক্রমশ...

'বরাক উপত্যকা' নামটি কেন? খুঁজতে গিয়ে যা মনে হলো, প্রাচীন নদী 'বরবক্র';[৩] তার বাঁক-বহুল সম্পন্নতা নিয়ে তার-ই তীরে গড়ে ওঠা জনপদ ছিল প্রাণস্বরূপ। সেই সাথে তার চারপাশে পাহাড় প্রহরী হয়ে বসতিযোগ্য এই উপত্যকা প্রাচীন মানুষের মুখে মুখে লোকসংস্কৃতির ধারায় মিশে ক্রমশ হয়ে ওঠে 'বরাক উপত্যকা'।

ভৌগোলিক কারণেই অতি প্রাচীনকালে ভারত আর্য গোষ্ঠীর লোকেরা ইতিহাসের বিশ্বব্যাপী চিরন্তন ধারার সঙ্গে সংগতি রেখে প্রতিবেশী বঙ্গদেশ থেকে ছড়িয়ে পড়িয়েছিলেন এই বরাক-সুরমা উপত্যকায়। এই উপত্যকায় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত গড়ে উঠেছিল একই সুবাদে।

সুপ্রাচীন অতীতকাল থেকে প্রবহমান বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার এই ধারা বিশ শতকে এসে

অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় পত্র পুষ্পে পল্লবিত। কাব্য, গদ্য, নাটক, প্রবন্ধ— সাহিত্যের সব কটি বিভাগেই বাঙালির তৃতীয় ভুবন এই 'ঈশান-বাংলা' তার স্বকীয়তা ও সমৃদ্ধিকে ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছে।

বিভিন্ন কবি, সাহিত্যিক, লেখকের কলমে বরাক উপত্যকাকে 'তৃতীয় ভুবন'[৪] বা 'ঈশান বাংলা' ইত্যাদি নামে অভিহিত করে অনেক লেখাপত্র হয়েছে যদিও, বাংলা ও বাঙালিকে বিভিন্ন ভুবনে ভাগ করে নিলে নিজেদের-ই যেন শক্তিক্ষয়ের একটা সংকেত বহন করে। বস্তুত কবিতার কোনো বিভাজন হয় না। কখনো কোনো ভৌগোলিক সীমানায় একে আবদ্ধ করা যায় না— এটাই ধ্রুব সত্য। তবু বরাক উপত্যকার কবিতাকে আলাদাভাবে বিভাজন করবে কারণ উন্নাসিক পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন বঙ্গসন্তান-সন্ততির প্রবল অ-বন্ধু অভিপ্রায়ে এবং ক্ষমতায় বৃহৎ বাঙালি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পারে না অসমের বরাক উপত্যকার বাঙালিরা, ফলে শক্তি যৌথ হতে পারে না। এই জন্যে বরাক উপত্যকার বাংলা কবিতাচর্চাকে বাংলা সাহিত্য থেকে আলাদাভাবে একটু না দেখলে তার প্রতি অবমাননা করা হবে।

বস্তুত বরাক উপত্যকা কাব্যের প্রাচীনতাকে ছুঁতে গেলে, খুঁজতে গেলে যে প্রাচীন কবি উঠে আসবেন তিনি হলেন ভুবনেশ্বর বাচস্পতি,[৫] যিনি ডিমাসা রাজাদের আমলের সভাকবি ছিলেন। এ ছাড়া প্রাচীন মধ্যযুগের লৌকিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ধর্মবিশ্বাস এবং পূজা-অর্চনার ছাদ দেখা যায় 'মনসামঙ্গল',[৬] 'চণ্ডীমঙ্গল'[৭] প্রভৃতি পাঁচালিতে। যা সমৃদ্ধ করেছিল বরাক উপত্যকার লোকসাহিত্যকে।

আসলে কাব্য মানে এমন এক ধারা যা মানুষ ও জীবনকে আনন্দমুখী করে তোলার জন্য যে অনাদিকাল থেকে সংগ্রাম ও যন্ত্রণা, বেদনা সুগভীর থেকে তুলে এনেছে তার অমৃত রসধারা আর এই কাব্যরসে মানুষের মন স্নাত হয়ে সত্যের প্রকৃত স্বরূপকে জানতে পেরেছে আর তখনই অস্থির মানুষ সুস্থির হয়ে স্থিতধী মানুষের মেধাবী, মনন, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন চিন্তাশক্তি কলমের সাহায্যে লিখে গেছে সেই সমস্ত মাইলফলকের কথা।

আজ সময়ের চোখ দিয়ে বিগতকালকে অনাধুনিক বা নিতান্ত আঞ্চলিক বলে এক পাশে ঠেলে রাখা অনৈতিক। কারণ সমস্ত খণ্ড খণ্ড রূপরেখা মিলেই এক সামগ্রিক চিত্র অনবদ্ধ রূপলাবণ্য পায়। আর তাই হেমাঙ্গ বিশ্বাস[৮] তাঁর একমাত্র কবিতা সংকলন "সীমান্ত প্রহরী"[৯] উৎসর্গ করেছেন মণিপুরের পর্বতকেশরী বন্ধু ইরাবত সিং[১০]-এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

প্রাক্ স্বাধীনতার যুগ থেকেই আমরা একজন উজ্জ্বল কবিকে পাই। তিনি হলেন অশোকবিজয় রাহা[১১]। সে যুগের কবিদের মধ্যে অশোকবিজয় রাহার কবিতা ভাবসম্পদ ও শিল্পরূপায়ণে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বুদ্ধদেব বসু[১২] তাঁর "AN ACRE OF GREEN GRASS"—গ্রন্থে অশোকবিজয় রাহার কবিতাকে "Cool dewye Lyrics" বলে বিশেষিত করেছেন। বরাক উপত্যকার অরণ্যপ্রকৃতি অশোকবিজয় রাহার কবিতায় স্বপ্নময় রূপ সৃষ্টি করেছে। সূক্ষ্ম অনুভূতিময়তা তাঁর কাব্যের প্রধান গুণ। 'ডিহাং নদীর বাঁকে'র[১৩] 'চিঠি' কবিতাতে লিখেছেন—

'আমি শুধু জানি আছি এ জ্যোৎস্নারাতে
কত কচি ডালে ফুলের প্রসব ব্যথা,
কুমারীর বুকে যত যন্ত্রণা নিয়ে

জন্ম নিতেছে 'প্রথম প্রেমের কুঁড়ি'।' (বাংলা কবিতাচর্চার রূপরেখা, পৃ. ৩৫৭)

মনে হয় বিশাল এক ক্যানভাসে কলম যেন তুলি হয়ে এঁকে যায় অসাধারণ এক চিত্ররূপ। 'ভানুমতীর মাঠ'[১৪] কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত তেমনি একটি কবিতায় এমনই এক চিত্ররূপ ফুটে উঠেছে—

"বেতারে কার সেতার বাজে, বাঙলা খবর শেষে
শুনে শুনে পথ দিয়ে যাই, মনে সুরের রেশ
মফঃস্বলের শহরতলি খানিকটা বন-ঘেঁষা,
ঝোপে-ঝাড়ে সন্ধ্যা নামে বুনো গন্ধে মেশা
বাঁকের মোড়েই হঠাৎ আসে রাঙামাটির টিলা,
ওর পিছনে উঁকি মারে পাহাড়টা একশিলা,
শেয়াল ডাকা রাত্রি আসে যেই আসি ওর কাছে
বাদুড়গুলো ঝাপটা মারে কাক-ডুমুরের গাছে,
মাথার উপর ডাকল পেঁচা চম্‌কে উঠি— আরে,
আধখানা চাঁদ আটকে আছে টেলিগ্রাফের তারে।"

অশোকবিজয়ের কবিতার জগৎ যেন এক বিশাল ল্যান্ডস্কেপ। আরণ্যক আর গ্রামীণ প্রকৃতির চিত্রকে তিনি পূর্ণতা দিয়েছেন মাঝে মধ্যে মানুষের ছবি এঁকে।

'আকাশ' কাব্যগ্রন্থের কবি মৃণালকান্তি দাশ[১৫] ছিলেন এক আলোকিত কবি—

'নিরালা আকাশে থেকে চাঁদ
এই শূন্য সময়ের পরে
বুনে যাক জ্যোস্নার ফসল
ফুলের পিপাসা যাক মিটে ঝরে যাক
কবিতার মতো কিছু জল।' (তদেব, পৃ. ৩৫৮)

কবির কাব্যে পরিচ্ছন্ন ও পরিণত ছন্দবোধ চোখে পড়ে, সনেটের প্রভাব রয়েছে। পরবর্তীতে দেখি— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের[১৬] বিভীষিকার মাঝেও কবি বিশ্বাস, প্রেম ও নীতিবোধে সুদৃঢ়। কবিতায় সেই দীপ্ত জয়গান—

'ঈশানের রক্ত মেখে এসেছে তো প্রণয় আবার
এখনো তবুও জানি, হবে এই জীবনের জয়
উদ্‌ঘাটিত হবে এই দ্রোহ-দীপ্ত মুক্ত দিগ্বলয়।' (তদেব, পৃ. ৩৫৮)

'সীমান্ত প্রহরী' কাব্যগ্রন্থের কবি হেমাঙ্গ বিশ্বাস 'মা তুমি শিগ্‌গির ফিরে এসো'—কবিতায় দেখিয়েছেন

পাহাড়ি সৌন্দর্যের দৃশ্য।

'পাইনবনে শীত-ভালুকের

গা-কাঁপুনি গোঁ গোঁ থেমে গেছে;

চিকন পাতার তারে বেজে উঠেছে

স্প্যানিশ গিটার।

বৈরাগ্যের বরফে ঢাকা

নগরীর কুমারী বুকে

পুষ্পধনু শর হেনেছে;

পত্রহীন শীর্ণ নাসপাতির জলে জলে

অফুরন্ত ফুলের সমারোহ।

এপ্রিল সকালে সোনালি রোদের ঢল নেমেছে।' (উত্তর-পূর্বের বাংলা কবিতা, পৃ. ২৪)

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মতই সুধীর সেনের কাব্যেও দেখি বরাকের নিসর্গের ছবি। বরাক উপত্যকার অগ্রজ কবিদের মধ্যে সুধীর সেন[১৭] প্রথম বৃহত্তম সাহিত্যের জগতে আধুনিকতার বীজ বপন করলেন। তিনি সরাসরি বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে[১৮] কিংবা জীবনানন্দ[১৯] প্রমুখের আধুনিকতাকে মেনে নিতে না পারলেও তার প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারেননি। তারই চিত্র ফুটে উঠেছে 'পাখির সংসারে' কবিতাটিতে।

'শেষ রাতে ঘুম ভাঙে প্রতিবেশী মোরগের ডাকে,

চালের ওপরে কাক হাঁটে—থপথপ, কা-কা সংলাপে মুখর।

আড়মোড়া ভেঙে উঠি। জলপাইরঙে খসে তোর—

কুয়াশার শাল গায়ে কে বাজায় সারেঙ। সুরের লহর।

খঞ্জন উঠোনে নাচে, ফড়িঙের পিছে ডাহুক-মিথুন,

তিন টিয়ে আমের পাতায় মিশে ক্যাঁক ক্যাঁক নিজেরে জানায়,

চড়ুইয়ের টুই টুই, গাছে ফিঙে দোয়েলেরা, অজানা পাখিরা,

শালিকেরা ওড়ে-বসে, একধারে কাক-ফিঙে কলহ জমায়।' (তদেব, পৃ. ৪০/৪১)

বরাকের জনপ্রিয় কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী[২০]। বাস্তবমুখী হয়েও অসাধারণ রোমান্টিক। তাঁর কবিতায় কান পাতলে শুনি—

'তুমি আমার ঘুম ভাঙা ভোর বাউল কণ্ঠে 'রাই জাগো' গান

তুমি আমার খয়রাতী দান রেশন-চালের পাথরকুচি

দূর-বিদেশে তুমি আমার খাল পেরোতে ভাঙা সাঁকো

তুমি আমার ঘুষঘুষে জ্বর নতুন জুতোর দুঃখ ও সুখ

ওপর-আলোর খুশি মেজাজ তুমি আমার তুমি আমার।' (বাংলা কবিতাচর্চার রূপরেখা, পৃ. ৩৫৯)

জীবনকে এমন করে দেখার এই বিপ্রতীপ প্রয়াস বরাক উপত্যকায় একেবারেই নতুন আর এই নতুনকে জড়িয়ে থাকা তির্যক বাচনভঙ্গি আধুনিকও। তাঁর ছন্দজ্ঞান অপরিসীম।

'অতন্দ্র'[২১] থেকে তাঁর জয়যাত্রা শুরু। ষাটের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত এ উপত্যকার ছোট পত্রপত্রিকায় শক্তিপদ ব্রহ্মচারী কাব্যচর্চা অব্যাহত রেখেছেন। শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর 'মনসামঙ্গল' কবিতাটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে বরাক উপত্যকা এবং বহির্বঙ্গেও। লোকমত জীবনের ঐতিহ্য নিয়ে 'মনসামঙ্গল'-এ কবি লিখেছেন—'কুপি লম্পে রাঢ়কানা নিরক্ষর বুড়ি'র মানবিক করুণ ছবি—

সপ্তডিঙ্গা মধুকর চারিদিকে জল

শ্রাবণের অবিশ্রাম মনসা-মঙ্গল

পচাপাটে এঁদো ডোবা বিষধর ফণা

ছেঁড়া কাঁথা-কানি আর বেহুলা যন্ত্রণা

হু হু করা কালসন্ধ্যা ভেসে আসা গানে

সায়ের ঝিয়ারি যায় অনন্ত ভাসানে'

অতন্দ্র বৃত্তের আরেক উল্লেখযোগ্য কবি— বিমল চৌধুরী[২২]। আমরা লক্ষ করেছি ঐতিহ্য এবং বহমান সময়ের দিকে মুখ রেখে কবি সমান স্বচ্ছন্দ। তাঁর কবিতার ঘরবাড়ি জুড়ে রোদ্দুর আর ছায়ার লাবণ্য ঝলমল।

'তুলসীর মঞ্চ ঘেঁষে পুবদিকে ডালিমতলায়

রক্ষণীয় হুলুধ্বনি সমবেত মঙ্গল, মঙ্গল

হিমেল হেমন্ত সন্ধ্যা সেদ্ধধানে ম ম উঠোনের

মাঝখানে বিছানো শীতল পাটি টুঙটাঙ কথা

হাতে হাতে গুয়া পান রসসিক্ত স্বাগত জীবন।' (আমার জন্ম) (তদেব, পৃ. ৩৫৯/৩৬০)

সমাজ এবং সংস্কৃতির মাঙ্গলিক চিহ্ন প্রকৃতি-ঘেঁষা আঞ্চলিক জীবনকে-ই স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রাকৃত জীবনের অনুভব-স্পন্দনে তাঁর কবিসত্তার সুর-তাল-লয়-গাঁথা, কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়।

উজ্জ্বল নক্ষত্রাবলী ক্ষোভহীন গভীর আকাশ

ভেসে আসে স্মরণের মৃগমদ চন্দন সুবাস। (চতুর্দশপদী)

উদয়ন ঘোষ[২৩] ছিলেন অতন্দ্র পরিবারের মেধাবী লেখাকর্মী তাই কাব্যভাষা পেয়েছিল অনন্য ব্যাপ্তি যার ফলে বৃহৎ কাব্যভুবন সখা বা সখীরূপে সেই সময় বরবক্র নদীতীরে বসতে, ভাব বিনিময় করতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করেনি।

উদয়ন ঘোষের কবিতা—

'গাছের মগডালে উঠে উঁকি মেরে দেখি

রবীন্দ্রনাথের কোনো জ্যোৎস্নালোক এখানে

পৌঁছুতে পারে কি না

হাত থেকে ছিটকে পড়ে রবীন্দ্র রচনাবলী, স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ

কাদায় জড়িয়ে

তবু বলতে চেষ্টা করি, বিষ্ণু দে'র চোখ দুটি ধার দিতে পার

আই ব্যাঙ্ক?' (তদেব, পৃ. ৩৬০)

কবি বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য[২৪] আধুনিক জীবনবোধ সম্পন্ন সচেতন কবি। প্রখরও বলা যায়, হয়তো প্রাবন্ধিক রমা পুরকায়স্থের[২৫] সুরে বলা যায়— 'প্রাকরণিক বিন্যাস দিয়েই তিনি কবিতার সময়কে ধরতে চেয়েছেন। তাই বিষয়ের চেয়েও আঙ্গিক তাঁর কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। বরাক উপত্যকার বাংলা কবিতায় যখন আধুনিকতার ছাপ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছিল ঠিক তখনই বৃহত্তর বঙ্গ সাহিত্যের অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের প্রকরণবাদী শ্রুতি আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক কবিতা-বিশ্ব তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। আধুনিকতা সম্পর্কে তাঁর ধ্যান-ধারণা ও প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ আলাদা আর তাই লক্ষ করি বরাক উপত্যকার অন্যান্য কবিদের থেকে ভিন্ন তাঁর পথ ও পাথেয়।'

বরাক আকাশে জ্বল জ্বল এক তারা কবি তপোধীর ভট্টাচার্য[২৬]। কলম জানে আর সময় জানে এই মানুষটি সাহিত্য ক্ষেত্রের কত বিচক্ষণ এবং মেধাবী কৃষক, যাঁর আছে আশ্চর্য সম্মোহনী ক্ষমতা। প্রবন্ধকার, গল্পকার হিসেবে বিশাল ব্যাপ্তির কাছে তাঁর কবিসত্তা— অসীম আকাশে এক ধ্রুবতারার মতো।

আগুনের কাছে এত দ্রুত যাবে?

যাও, তবে জলের করুণা

শিখে নিয়ো।

('আবহ' তুমি সেই পীড়িত কুসুম)

'এই কৃষ্ণপক্ষে এসো খুঁজি কোথায় মানুষ...

ধর্মের কুহকে নয়, ঘনকালো রাত্রির আবরণে নয়

যেখানে স্বপ্নে স্থাপত্য গড়েছে মানুষের ভাষা

সেখানেই বিনিময় করি হাসি, অশ্রু আর ক্ষমা চাই

মানুষের কাছে যে মানুষ আলোর সন্তান....'

(কৃষ্ণপক্ষ) (তদেব, পৃ. ৩৬১)

তপোধীর ভট্টাচার্য এমন একজন কবি যিনি তাঁর কবিতায় স্থানিকতার কোনো ছাপ রাখেননি। আদ্যন্ত

বরাকের কবি হয়েও তাঁর কবিতায় কোথাও বরাকের নাম কখনো ফুটে ওঠেনি। বলা যায় তিনি যদি বরাকের না হয়ে বিশ্বের অন্য কোনো জায়গার কবি হতেন তখনো তাঁর কবিতায় এই সর্বজনীনতাই ফুটে উঠতো। তাঁর তেমনই একটি কবিতা 'স্বখাত সলিল কথা।'

সব পাঠ শেষ হল, বাচনের আয়ুষ্কাল হল শেষ

এবার শোনাই স্বখাতসলিল কথা

.....

শিকড়ের গায়ে গায়ে উন্মূল মাটির শোক, বোবাদের

বিষণ্ণ গ্রন্থনা আর বধিরের নীরবতা

.....

এই দাহ, আমার নিজস্ব পাশাখেলা

নগ্ন দেহে ডুবে যাই স্বখাতসলিলে"

এমন বোধিবীজে দীপ্ত এই কবি হৃদয়। তাই প্রবান্ধিক তপোধীর থেকেও কবিতার নিবিড় পাঠকেরা তাঁর কবিতায় চারণ করেন বেশি।

দেশ কাল সমাজ সচেতন কবি অনুরূপা বিশ্বাস[২৭] এক লড়াকু কবি। তাঁর কাব্যগ্রাউন্ডে আছে সংগ্রামের ছবি-লিপ্ত ক্যানভাস। বরাকে ষাটের দশকে কবিতা যখন কবির পৌরুষে দৃপ্ত ও বাঁধ ভাঙা তখন অনুরূপা কবির মানবী আলোয় আরও দৃপ্ত ও কবিতার কাছে সুগভীর অঙ্গীকারবদ্ধ।

'শিরায় রক্তের ছোটা, মনে হয় জীবনটা

ছোট বেলাকার, সেই খেলবার মাঠ

খেলা খেলা নাটকের কুশীলব সেতো যেতে পারি

পাঁজর মুকুট পরে অনায়াসে হতে পারি গর্বিত সম্রাট!

এমনি না বোঝা নিয়ে চলো না এগিয়ে যাই দেখি

রক্ত চাপে ভালোবাসা সব মিলে বহমানতায়

পৃথিবীর অগ্নিদগ্ধ ঘাসগুলো বারবার প্রাণ পায় কি না'

(কিছু কিছু বৃক্ষ আছে বলে) (তদেব, পৃ. ৩৬১)

আশির দশক— বরাকের কাব্যচর্চায় নতুন করে জোয়ার আসে। প্রতিবাদী কবিতায় অসমের বিদ্বেষ হিংসার বিষবাষ্প কবিচিত্তে দারুণ আঘাত হানল, কবি লিখলেন—

আমার স্বদেশ নেই মানচিত্র হতে মুছে গেছে

কবির স্বদেশ বাঁচে মনের ভূগোলে

মানুষের প্রেমপ্রীতি মৈত্রী গড়ে

ইতিহাস ইমারত আজ ভেঙে গেছে

ধূলায় মিশেছে সব—সব গর্ব সাধ অহংকার

মানুষী সভ্যতা কাঁদে আসামের শ্যামল প্রান্তরে...

কবির 'উনিশে মে আয়ুষ্মান হও'[২৮] কাব্যগ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কারণ ১৯৬১-র বাংলা ভাষা সংগ্রামের এক স্বচ্ছ দর্পণ এ কাব্যগ্রন্থ। এখানে কবিচেতনা শহিদদের প্রতি নানা শ্রদ্ধায় চিরদীপ্যমান। কবি তপোধীর ভট্টাচার্য অনুরূপা বিষয়ে তাই লেখেন— 'কবি অনুরূপা বিশ্বাস জেগে আছেন, জেগে থাকবেন সময় প্রহরী হয়ে, আগামীকালের জন্যে পরশপাথর আর পৃথিবীর মায়াবী চোখ খুঁজে খুঁজে।'

কবি ছবি গুপ্তা[২৯] বরাকবধূ, শিলং কন্যা। কবিতা তাঁর বিজন দর্পণে প্রতিভাত আলোক সামান্যা, শব্দবিভায় গড়ে ওঠে আশ্চর্য আরোগ্য নিকেতন—

'—বরাকের নায়রী হবে বোরো চালের মোটা ভাত

ছোট পুকুরের জিয়ল মাছের ঝোল

কুমড়ো ডাঁটার চচ্চড়ি

হাতের রোয়া শীতল পাটি আন্তরিক সহবাস।'

(সহবাস, শব্দবিভাবরী) (তদেব, পৃ. ৩৬২)

এই ভুবনে আনতে গিয়ে কোকিল ডাকার বন

রাতকে নিলাম মুঠোয় ভরে দিনকে ধরে রণ

('এই ভুবন', বিজন দর্পণ)

বরাকের আরেকজন কবিকে আমরা পাই যাঁর মধ্যে বুদ্ধদেব বসু কিংবা বিষ্ণু দে অথবা জীবনানন্দ প্রমুখের প্রভাব বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তিনি হচ্ছেন ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ[৩০]। তাঁর 'ইতিহাস' নামক কবিতাটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সেখানে শুধু জীবনানন্দের মতো প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে নারীর তুলনাই নয়, বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য কবির মত রগ্‌রগে আধুনিকতাও স্থান পেয়েছে।

'অমলতাস গাছের ছায়ায় ঠিকাদার বাবু বসে আছেন।

ওই দ্রাবিড় রমণীর চুলে লেগে আছে হরপ্পার মেঘ

বুকে স্নানাগারের ধ্বংসাবশেষ।

.....

দ্রাবিড় রমণী জানে মাংস এখন খুবই সস্তা।

এখানে পেচ্ছাপ গন্ধে সন্ধ্যা নামে।

নর্দমার থেকে উঠে আসে কৃমিকীট অন্নের থালায়।

হা ক্লান্ত শরীরে ঠিকাদারবাবুকে সুখ দিতে হয়।

না হলে এটুকুও জুটবে না এই রমণীর।' (উত্তর পূর্বের বাংলা কবিতা, পৃ. ৬৬/৬৭)

শান্তনু ঘোষও[৩১] ছিলেন লেখাকর্মী পরিবারের অন্যতম একজন কবি। যাঁর কবিতার অনন্য ব্যাপ্তির ফলে বৃহৎ কাব্যভুবন বন্ধুরূপে সেই সময় বরাকতীরে বসতে, ভাব বিনিময় করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। শান্তনু ঘোষ লিখেছেন—

'শরীরের ভিতরে চলে গেছে, দিবসরজনী সখী

শোনা যায় কি ডাক্তারের পদধ্বনি তোমার বুকের

গভীরের নিশীথ বেলায়

রাত্রি হলে আমি আসি, তোমার জানালায়

কুয়াশায় সজ্জিত বেশবাস, আমি কান পেতে রই, শুনি

ঝিল্লিরব, আমি আভূমি নত

তোমার পায়ের আশেপাশে, কেশচূড়ে ঐ ধুতরা ফুল বেঁটে

আমি আছি তোমারি কাছাকাছি,

তুমি-ই আমার কৌতুক, আমার বিষাদ, হে

আমার বরাক কিংবা ব্রুকলীন ব্রিজের শহর।'

(বরাক কিংবা ব্রুকলীন ব্রিজের শহর)[৩২] (বাংলা কবিতাচর্চার রূপরেখা, পৃ. ৩৬০)

পরবর্তীকালে বরাকের কবিদের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় কণ্ঠস্বর ফুটে উঠেছে। মনোতোষ চক্রবর্তী যেমন লিখেছেন—

'আজ হাস্যোজ্জ্বল মিজো তরুণীরা

রঙিন পোশাকে ঝলমল-বার্মিজ ছাতাটি পেলে

নেমে আসুক না আমাদের শান্ত সমতলে, আজ

সমস্ত বৈরী সাজ ত্যাগ করে মিত্র হাত প্রসারিত করো।' (উত্তর পূর্বের বাংলা কবিতা, পৃ. ১১৬)

প্রতিবেশী রাজ্য মিজোরামের কথা সাবলীলভাবে কবিতায় উঠে এসেছে মনোতোষ চক্রবর্তীর[৩৩] হাত ধরে।

বরাক দুহিতা কবি মেধাবী স্বর্ণালী বিশ্বাস ভট্টাচার্যের[৩৪] কবিতায় কান পাতলে ধ্বনিত হয়— 'শব্দ আর/শব্দের শবের ওপর/শুয়ে আছে কবি /নির্মোহ, বীতশোক।/তার নিজেকে ভাঙা শেষ/তার নিজেকে গড়া অসম্ভব।' তাঁর নির্মেদ লেখায় অনিবার্য, অমোঘ বড় স্পষ্ট উঠে আসে জননীর মাঝে মানবী সত্তাটি বড় সুন্দর তুলে আনেন স্বর্ণালী—

'তবু নিশ্চয় জানি/সিঁদুর টিপের পিছে

ত্রিনয়ন লুকানো রয়েছে।/ আসলে ঈশ্বরী তুমি/

ভালোবেসে হয়েছ জননী।'

(জননী) (বাংলা কবিতাচর্চার রূপরেখা, পৃ. ৩৬৩)

কবি স্বর্ণালীর রোমান্টিসিজম ছুঁয়ে শুনি—

'রাত্রির উপকূলে/ জ্যোৎস্নার রূপালি বন্দর

বিছানা-জাহাজ থেকে দেখা যায়/নীল সমুদ্দুর।

সমস্ত আকাশ জুড়ে/ মোহনায় আমাতে তোমাতে,

একটি দীঘল সেতু/গড়া যায়, অন্তহীন রাতে।'

(সেতু) (তদেব, পৃ. ৩৬৩)

দেশ বিভাজনে যে কবির জীবনে নিয়ে এসেছিল ক্যাম্প জীবন, যা ক্রমশ শেকড় ছড়ায়, সেই কবি করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য[৩৫] কবিতা-সুন্দরীর কাছে নিরলস ছিল তাঁর আত্মসমর্পণ।

'পূর্বদিকে শাঁ শাঁ খোয়াইয়ের বান ডাকা জল

ডুবে গেছে মাঠ,

ঘোলা জলে চারদিকে শাদা

গ্রামখানি ভেসে আছে জলের উপর

বোঝাই নোঙর করা জাহাজের মতো

বাঁদিকে সড়ক...'

(তদেব, পৃ. ৩৫৮)

আবার কবি রামেন্দ্র দেশমুখ্যের[৩৬] কবিতায় দেখি

'ফুলের পদক দিও তাঁকে মৃত্যুকালে

মাটির তিলক দিও শিল্পিত কপালে,

দিও তাকে বিহঙ্গ পদবী।

মন্ত্রের ভাষায় বলো, কাছাড়ের কবি

ফিরে এসো জন্মান্তরে মায়ের নিলয়ে—

বরাকের বকুলের প্রসন্ন বলয়ে।...' (তদেব, পৃ. ৩৫৯)

কবি ছবি গুপ্তা বরাকের কবিতার্চ্চায় আধুনিকতার চিন্তাবাহী দূত।

নিভৃতির শিকড়বাকড় ছুঁয়ে কবিতার আলয়ে বসবাস কবি অশোক বার্মার[৩৭]। কবির অর্ধেক আকাশ[৩৮]-অন্নপূর্ণা দেবী বার্মাও[৩৯] কবিতার সাথে সই পাতিয়েছিলেন সেই কবে! আজও চলে কবিতা সই-এর সাথে অপরূপ খেলা। কবি অশোক বার্মা জীবনের দেনা-পাওনার সেই সূক্ষ্ম হিসাব পেরিয়ে কবিতার সুগভীর কেন্দ্রে মগ্নপ্রাণ আজ। স্থানীয় কবিদের কবিতা অনুবাদ তাঁর এক অন্যতর কর্মকাণ্ডে পড়ে। মূল বাংলা থেকে হিন্দিতে অনুবাদের ফলে কবিতা-রসগ্রাহী পাঠকের কাছে এই অনুবাদ কর্ম যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে।

সাতের দশকের বরাক উপত্যকার কাব্যভুবনে জেগে উঠলেন যে কবিরা অনন্য আশাবাদের কুহুকণ্ঠে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী কবি হলেন অমিতাভ দেব চৌধুরী[৪০]। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত যাঁর কলমের জোর এখনও সমশক্তিতে বিদ্যমান।

অমিতাভ লেখেন এমনি ভাষায়—

পাথরের ভাষা লিখি
জলের লিখনে।
যদি কোনোদিন
পাথরের বুকে
ফুটে ওঠে একটি লাজুক
কুঁড়ির আভাস।
এই সাধ, টের পাই,
জলের গহনে।
('কেন লিখি')

কিংবা,

শান্ত কোলাহলগুলি সরিয়ে রেখেছি সবিনয়ে
খুঁজেছি ব্যস্ত নীরবতা।
একদিন এ জীবনে উঠবে রোদ্দুর
লেপ, পাণ্ডুলিপি সব ঝেড়েঝুড়ে শুকোব উঠোনে
ইচ্ছে ছিল এই মেঘে-ঢাকা।
.....
ইঁদুরের এঁটো সব অক্ষরমালা
গোপনে সাজাই একা একা

যা লিখেছি এতদিন, সবই বাসি কথা।

('বাসি কথা')

সাতের দশকের শেষ আটের দশকের শুরুতে আমরা পেয়ে যাই শংকরজ্যোতি দেব[৪১], সৌমিত্র বৈশ্য[৪২], শেলী দাস চৌধুরী[৪৩] প্রমুখকে। কবি শংকরজ্যোতি দেব পেশায় ডাক্তার হলেও তাঁর কাব্য কণ্ঠস্বর বেশি জোরালো বলেই তাঁর কলমে উঠে আসে—

'এক একটা খরার রাত ভেঙ্গে গেলে
আঁধার ভেজা শুভ্র কণিকার পৃথিবীটা
একা-একা গেয়ে যায় দহনের গান
এক একটা দুঃখের দিন ভেঙ্গে গেলে
আকাঙখার কোমল বৃন্ত ঝরে যায়
নীলিমার ঘুম, ঘুম, ঘুমের গহন।
...
এক একটা পৌষের রাত ভেঙ্গে গেলে
জ্যোৎস্না-ভেজা হেমকণিকার পৃথিবীটা
একা-একা গেয়ে যায় প্রতীক্ষার গান।'

('ঘুম') (তদেব, পৃ. ৩৬৩)

কবি সৌমিত্র বৈশ্য—গল্পকারের আড়ালে যে কবিটি মুখর থাকেন, তাঁকে তফাত রাখেন ব্যক্তি সৌমিত্র। কারণ অজানা থেকে তাঁর কবিতা আমাদের বহুদূর নিয়ে যায়—

তুমি-ই সরল সত্য/সিন্ধুনদী সম্মুখে শয়ান/অকস্মাৎ যদি
ভাঙে ঘুম,/জানলায়, তাকিয়ে দেখো, ঐ দূরের নদীতে/
মাঝিদের, মাল্লাদের সাথে, ঢেউ,-তার/
মিতালী হয়েছে খুব
সাঁঝের গগনে তারা বেড়াতে যাবে যে, আজ/
অনন্ত পিদিম শিখা, সঙ্গীতার
সাদা জুঁই ফুল/কি গন্ধ, কি গন্ধ সে কি মাতাল সমীরণ/
কে এলো এই অবেলায়/ ঐ চুল, কালো চুল, খোঁপা ডেকে
নেমেছে যে ঢল/...

আবার শেলী দাস চৌধুরীর কবিতায় চোখ রাখলে মননের পারাপারে ধাক্কা দেয় ঢেউ—

....আমার শেকড়সুদ্ধ বৃক্ষকে উপড়ে দিও না সম্রাট/

আমার শেকড় সুদ্ধ বৃক্ষ; ভালোবাসা / ফুল ফুটাব আমি,

তৃষ্ণার ফল/আর পায়ের নীচের এই গর্ভিণী ধরিত্রী

মহীয়সী নারী, অনন্ত প্রশ্রয়ের এই আকাশ/প্রাণে ঘ্রাণে

ভরে যাবে স্পর্শে স্পর্শে মানুষের/ প্রত্যয়ের অনন্ত স্রোতে অমেয়

বীজ/উপড়ে দিও না সম্রাট।

রোমান্টিক কবি দীপঙ্কর নাথ[৪৪] বরাকের অন্যতম আরেক উজ্জ্বল কবি। বিষাদ-আনন্দ-ঐতিহ্য নিয়ে চলতে চলতে লিখে যান—

বেড়াতে এসেছি/সহসাই, ফিরে যেতে হবে জানি/

ফিরে যেতে পারি/

তবু, জন্মসহা আজন্মের এ নিভৃত আলাপচারি।

(আলাপচারি, বেড়াতে এসেছি)

দাঁড়িয়ে

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো

ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।"

- - কঠোপনিষদ

নিজস্ব বিশ্বাসে তুমি স্থির বৃক্ষের সুঠাম দাঁড়িয়ে রয়েছ

প্রত্ন-প্রধান লতা তোমাকে ঘিরেছে আজ

বল্মীকের মতো; তুমি ক্লান্ত হও

দ্বাদশ-বর্ষীয় এক ঝলকের ধ্যানী চোখ তোমাকে সম্যক

দেখেছিলো, মনে পড়ে, তার সকরুণ চিত্তকোষে তুমি,

অবাঙ্‌মনসগোচর, আজো

অবহিত বিশ্বাসে স্থির বৃক্ষের মতন দাঁড়িয়ে রয়েছ।

ষাটের দশকের সময়টা ছিল অস্থিরতার সময়। মেধা বা মনন জীবন সত্য খুঁজতে আঞ্চলিকতাকে চিঙিয়ে তখন উড়ালো পাখি বৃহত্তর বাংলা কাব্য ও সাহিত্যের আকাশে, এই সময়ের কবির। কেউ কেউ বাস্তব জীবনের চূড়ান্ত চাহিদায় পা বাড়িয়েছেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের শেকড় ছড়িয়ে রেখেছেন।

আলোকিত কাব্যলক্ষ্মী আরো সন্তান-সন্ততি। এদের মধ্যে যাঁরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হচ্ছেন

বনশ্রী বক্‌সি[৪৫], কাব্যশ্রী বক্‌সি ভট্টাচার্য[৪৬], স্মৃতি দত্ত[৪৭], শর্মিলা দত্ত[৪৮], অর্জুন চৌধুরী[৪৯] প্রমুখ। এই সময় কাব্যশ্রী লেখেন 'পাগলি মেয়েটা'—

"রাত্রিগুলিকে বোরেগী করেছে মেয়ে,
একগলাজলে ভেসে গেছে সাজপান এবং স্বপ্ন
আলুথালু ওকে পাগলি গা খোলা?"

কাব্যশ্রীর কবিতায় খুব সুন্দরভাবে ফুঁটে উঠে এক দিকে ফেমিনিজম অন্যদিকে প্রকৃতির কারুকার্য। ফেমিনিস্ট কবি কাব্যশ্রী 'পাগলি মেয়েটা'র মধ্য দিয়ে প্রকৃতি এবং নারীর এক নিগুঢ় সম্পর্ককে চিত্রায়িত করেছে 'পাগলি মেয়েটা' এই কবিতায়।

"সেই থেকে এই সৃষ্টিছাড়ার ডানহাতে খোলা ছুরি
জল চিরে দেয় ছিঁড়ে দেয় ঢেউ সাপেদের জিভগুলি
ক্রমে থেকে যায় দিঘল ঝাপট ক্রমে থেকে যায় বান
পাগলি মেয়েটা পচাগলা শবে হেসেকুটে শত খান।"

কখনো আবার কাব্যশ্রী মৌনতাকেও কবিতায় নিয়ে আসেন খুব সুনিপুণভাবে। এই ধরনের কবিতার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ 'সাপুড়িয়া' কবিতাটি।

সাপ খেলানো বাঁশি বাজায় সকলসময়
অন্ধকারের আবর্তে এক সাপুড়িয়া
হেলেদুলে শরীর খানায় সর্পিল এক নাচের তালে,
ঘন ঘন বাজিয়ে চলে সাপের বাঁশি—
...
বিজলি যেন চম্‌কে ওঠে,
চকচকে দুই চোখের মণি অগ্নিশিখায় চিতা জ্বালে
...
সাপুড়িয়া অনায়াসে বিষাক্ত সেই সাপিনীকেই
চুম্বন দেয় ওষ্ঠে তুলে,
বিষের নীলে ভালোবাজার নীল মিশলেই
কষ বেয়ে রক্ত ঝরে,
মৃত্যু শীতল।

চলে এল ২০০০ সাল ও পরবর্তী সময়, পেছনে রয়ে গেছে আরও বহু পঙ্‌ক্তিমালা আবিষ্কৃত, অনাবিষ্কৃত, রয়ে গেছে প্রেমিক ও সংগ্রামী কবিদের নাম। একথা অবশ্যই বলা যায়—কবিবংশের এই সকল কবির হাতেই আলোর লণ্ঠন জ্বলছে, মেধার জোনাকি আঁধারে আলো। আমাদের খোঁজা অর্ধ সমাপ্ত নয়, চলছে। সেই খনির হিরে তুলে আনতে হবে অন্য কোনও সাদাপাতার পূর্ণতার জন্য।

কবি স্মৃতি দত্ত[৪৭] লেখেন—

....সেতুবন্ধন করি দিন রাত

তবুও আসে না উল্লাস

ছায়াকে দ্বিখণ্ডিত করে বারে বারে উড়ে পাখি

বসে থাকি নীরবে

স্মৃতিহীন মেধাহীন একাকী।

মানবীর রুদ্ধ বেদনা লেখে সময়ের ব্যাঘাত। এভাবেই স্মৃতি বহুকাল কবিতায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আজ বোঝা যায় বা কিছুটা দূরত্বে। একি অভিমান? একি উদাসীন বেদনা?

মানবী চেতনার উদ্ভাস নিয়ে আর এক কবি বরাকের বুকে চেতনাময়ী। সময় এ কবির কাছে আশা রাখে—কিছু উজ্জ্বল উদ্ধার অন্ধকারের অতল থেকে। এ কবি শর্মিলা দত্ত[৪৮]— অণুগল্পে হাত যাঁর দক্ষ নির্মেদ অথচ মূল কথায় স্পষ্টবাক্। গল্পকারের আড়ালে আসলেই একটি রক্তাক্ত সময়ের অমানবিকতার কৃষ্ণ ঘোমটায় শঙ্খধ্বনি ও আনন্দরবের কুলুতান, এ তানে খেলে ওঠে বৃষ্টি ও বসন্ত। এবারে আমরা চোখ ফেরাবো শর্মিলার কবিতার দিকে।

কেন বলো-ভাঙ্গন?/ কেন বলো-ধ্বংসস্তূপ?/

কেন বলো পোড়ো বাড়ি?/ কেন বলো-এ ইতিহাস?/

কেন ছাড়ো দুঃখশ্বাস?/ চেয়ে দেখো ঐ কোণে শেকড়ের অঞ্জলি/

ছোট অশ্বত্থ/ ছোট শিশু বট।/

শেকড়ের নামে। টুপটাপ হাসি।/ ফুল ফুল বয়ে যাওয়া/

ঝর ঝর ঝরে যাওয়া/

এ কেবলই-ই প্রাণ/ এ কেবলই স্পন্দন/

ভাঙ্গা ইট, ভাঙ্গা দেওয়ালের অন্দরে/

বৃষ্টি মেয়ের অমৃত মন্থন।

সামগ্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ তারুণ্যই বদলে দিতে পারে দেশ-কাল-রাষ্ট্রের ভাষা, তাই কবি বিশ্বরাজ ভট্টাচার্যের[৪৯] কবিকণ্ঠে শোনা যায়—

স্বাধীনতা মানেটাই যেন তিনবেলা একথালা গরম ভাত হোক।

স্বাধীনতা মানেই জনতার কবলে পড়ে

'মুখোশধারী/জনদরদী নেতা' জব্দ হোক।

স্বাধীনতা মানে আমার ছেঁড়া শার্টেও দু-একটা বোতাম লাগুক

আর স্বাধীনতা মানেটাই যদি স্বাধীনতা হয়

তাহলে সেটা আমারও হোক তোমারও হোক।।

কবি অর্জুন চৌধুরীকে[৫০] এভাবে পাওয়া যায়—

সম্প্রতি এক পাখি উড়ে এল

আমার সবুজ জোয়ারের বুকের উপর

যদিও পাখি অন্য কোন নামে

জবাব দেয় না আমার আর্তনাদে

পাখির কুজন রাতের পর রাত শুনে যাই

পাখির ডাকে আমার একটি নাম খুঁজে পাই।

চেতনার তরঙ্গ ভেঙ্গে গড়ে ওঠে কবির ভেতর অন্য কেউ অন্য ডাকে। মুন্না চক্রবর্তী লেখেন স্মৃতি, তবু সেও কোনও না কোনো ভাবে আলোর-ই কথা আসলে যাবতীয় ধুলো ঝেড়ে কেন্দ্রের দিকে ফিরে আসা নিয়তি আমাদের তবু বলা যেতে পারে সময়ের স্মার্টনেস এই কবির কাছে অধরা কিন্তু কবির জীবনে বহু পথে দুঃখ বেদনা থাকলেও কবিতাভুবনে চাই তাঁর স্মার্ট ও শার্প ভাবনাজাত ফসল। তাঁর পঙ্‌ক্তিতে যখন নজর পড়ে—

দহন যত মনের গহ্বরে, হৃদয়ের অন্তঃপুরে চিরজীবী,

সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না,

সময়ের অবগাহনে সময় চলে যায়,

বিদায়ী বেলায় মনে থেকো, মনে রেখো,

ভালবাসার মোহনায় জীবন খোঁজ।

কবি লীনা নাথ[৫১] এক স্বপ্ন-দেখা মানুষ, বলা যায় জন্ম রোমান্টিক। সংসার জীবনের রথাশ্ব ওড়াতে পারেনি ধুলোঝড় তাই স্বপ্নের ঐ জগতে আজও সংকেতে ডাকে, আয়—

আমরা ক'জন চলেছি দুর্দান্ত সময় অতিক্রমে

আপতিত রশ্মি পাহাড়ের সূর্য ছোঁবে বলে,

ইচ্ছে করলেই ছুঁয়ে দিতে পারি

স্বর্গ, মর্ত, পাতাল,

হাজার পরিযায়ী পাখির ডানায় মিশে

সাঁতার কাটতে সমুদ্র নীলাকাশে

যেখানে মেঘালী বুকের মাঝে বন্দি জলভার...

মুঠোয় ভরে নেব বর্ণমালা—ছুটিয়ে যোড়া

আমরা ক'জন চলেছি...সূর্য ছোঁব বলে।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে আমরা বরাক উপত্যকায় পেয়েছি এক অশোকবিজয় রাহা। ক্রমশ প্রতিকূল সময় সাঁতরে অনেকানেক বিরুদ্ধতা সয়ে যে কবিরা উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন, কবি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ভক্ত সিং[৫২] হলেন অন্যতম। ভক্ত সিং এবং তাঁর সমসাময়িক কবিরা কাব্যচর্চার ধারাকে গতিবেগ দিয়েছেন। এসেছে আধুনিকতার নতুন ছোঁয়া কারণ বরাক উপত্যকা তখন ক্রমে ক্রমে যাপনে সময়ের ব্রাশ দিয়ে ঝেড়ে নিচ্ছে চিন্তা-চেতনা-ভাবের আবেগের সীমায়িত সংজ্ঞার ধুলোবালি। প্রাচীনতা যেমন সত্য তেমনি প্রাচীনতাকে পেছনে রেখে এগিয়ে যাওয়া-ই যুগধর্ম, সমুদ্রে মেশার আকুলতা প্রবল সকল নদীরই, তেমনি নাগরিক কলকাতাকে নিয়ে তুমুল প্রেম দুরন্ত কবিগোষ্ঠীর। আর এই প্রেমাভিসারেই তৈরি করে যে স্মার্ট ছোট পত্রিকা সেগুলো বলা যায়— অতন্দ্র, শতাব্দী[৫৩], লুব্ধক[৫৪], উদর্ক[৫৫] ইত্যাদি।

ভক্ত সিংহের পাখি, ভালবাসাময় কবিতায় পাই—

'নিজস্ব আলোক থেকে মধ্যে মধ্যে

সরে যায় ক্লান্ত প্রতিধ্বনি

বুকের ভেতর তার, নিয়ত শব্দের ঝাঁক

ওড়ে রক্তের প্রান্তরে

....

এভাবেই

উড়ু উড়ু অন্ধকার-উড়ছে পাখি

ভালবাসাময়।' (এই আলো হাওয়া রৌদ্রে, পৃ. ১২৭)

আবার 'বুড়ো' কবিতায় লিখেছেন—

'আহা কি অপূর্ব হলুদ ও নীল পাখির ডিম্ব

ঝকঝকে রূপোলী দিন ও ফলাবাসন

.....

কতোটা রঙীন

এইভাবে বুড়ো ডুবে থাকে শব্দহীন কবিতার পয়মন্ত শরীরে' (তদেব, পৃ. ১২৮)

'নাতি' কবিতায় কবির বয়ান—

'খবর কাগজ পড়া শেষ হলে

সারাটা দুপুর ক্লাউনের বুক পকেটের মধ্যে

আঙুরের বেদনায় মসৃণ

.....

বারোটার কাঁটা রাত্তিরের ট্রেন—

তার নাতি তারো বুক পকেটের মধ্যে ব্যথা আছে

জানে সে একজন বিজয়ী পুরুষ' (তদেব, পৃ. ১২৮)

স্বাধীনতা পরবর্তী অসমের বাঙালি আধুনিক কবিদের মধ্যে শক্তিশালী কবি দেবাশিস তরফদার[৫৫] অন্যতম একজন। তাঁর কবিতায় বাঙালিদের ভিটে-মাটি ছাড়ার যে বেদনা, উদ্বাস্তু চেতনা, এবং অসম আন্দোলন যার প্রভাব বরাকেও পড়েছিল, তার যে যন্ত্রণা সেই যন্ত্রণারই আর্তপ্রকাশ ঘটেছে বার বার তাঁর কবিতায়।

ডিসেম্বর ১৯৮২ : ২

'শীতের বারান্দা থেকে উষ্ণনীলদেশে

উড়ে গেলো খুকী

মেঘ তছনছ করে উড়ে গেলো।

আমি তো ক্ষুদ্র, ভীরু, বুড়ো আংলা ছেলে

নভোচারী হাঁস নেই, খুকীদের ডানা তো রয়েছে

পাহাড়ের অন্যপারে গেলে ভালো হয়

....

আমাদেরও গালে। চিরবিকেলের ছবি।

খুকীর ডানায় চেপে গল্পসম্ভব এক

জার্নি করি এসো!' (তদেব, পৃ. ১২৯)

ভিটে-মাটি ছাড়া মানুষের ভেতরের যে আঘাত বা যন্ত্রণা কিংবা উদ্বাস্তু জীবনের যে ঘাত-প্রতিঘাত এর মর্ম তাঁরাই বুঝতে পারে যাঁরা সরাসরি এই ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়েছেন। তবে হ্যাঁ, সাধারণ মানুষ শুধু টানা পোড়েনটাই সহ্য করে কিন্তু কবি তাকে রূপ দেয় ভাষায়। যে ভাষা শুধু কবির মুখের ভাষা হয়ে থাকে না এখানে উঠে আসে বহুদিন পর আপন ভিটে মাটিতে ফিরে আসা সমস্ত উদ্বাস্তু মনের কথা। তাই দেবাশিস তরফদার লেখেন—

আমাদের বাড়ির যে কোনো কামরা থেকে চোখ অনেক দূর

যেতে পারে। আছে অনেক জানালা, আর প্রচুর আলো, কতদিন

পরে আমরা এলাম।

.....

যাই, পুবদিকের জানালার পাশেই বসি গিয়ে। গলি, ছায়া,

রৌদ্র। হয়তো ফেরিওয়ালাও আসবে, কতদিন এই গলিটা দেখিনি।

(আমাদের বাড়ি)

এই সময় তরুণ কবিদের মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী কবি তমোজিৎ সাহা[৫৭]। তাঁর কবিতায় জীবনের যন্ত্রণা, পথ হারা পথিকের পথ খোঁজার আশা কিংবা নিজের যন্ত্রণাকেই যন্ত্রণালিপিতে স্বাক্ষর করে রাখার ছবি ফুটে উঠেছে।

দিনান্তে শস্যের হাসি দেখা যাবে

মা আমার দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে বৃষ্টি ভিজে

আমার জমিতে শস্য ফলেনি যে

শূন্য হাতে আমি তাই ফিরতে পারি না

মাঠে মাঠে উঞ্ছবৃত্তি, মার মুখ ভাসে বারে বারে।

(শস্যের জীবন)

ছেঁড়া পাতাতেই লিখি ছেঁড়া জীবনের লিপি

ছেঁড়া, যেন কে বা কারা খাবলে নিয়ে গেছে বুক অনেক অনেকখানি

এই ভাঙন শহরের পথের বুকের মতো

প্রাণহীন পাঁজরে আটকে গেছে আমাদের পথ।

ছেঁড়া পাতাতেই শব্দ লুকিয়ে রাখে বুকের যন্ত্রণা।

(যন্ত্রণালিপি)

পথ দাঁড়িয়ে আছে

কোথাও যাওয়ার নেই তার

থাকে সে অপেক্ষায়, পথিকের

পথের টানে যার গান গেয়ে যাওয়া

(বাউল)

এভাবেই লিখে যান বরাকপারের কবিরা। শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর কবিতায় যদি থাকে দেশভাগ, উদ্বাস্তু জীবনের মর্মবেদনা তাহলে তপোধীর ভট্টাচার্যের কবিতায় ফুটে ওঠে শাণিত মেধা। আবার অমিতাভ

দেব চৌধুরীর কবিতায় আবার ধরা পড়ে সমকালীন সমাজজীবন। ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ যখন লেখেন ছন্দ মিলিয়ে কবিতা, পীযূষ রাউত[৫৮] কিংবা শর্মিলা দত্ত সেসবের ধারই ধারেন না।

বরাক উপত্যকার কবিদের রচনায় প্রগাঢ় প্রভাব ফেলেছে দেশভাগ ও ভাষা আন্দোলন। ১৯৬১সালের ১৯ মে শিলচর রেলস্টেশনের পাশে বাংলাভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন এগারোজন। এই বিষয়টি নিয়ে প্রায় সব কবিরই কোনো না কোনো কবিতা রয়েছে।

বরাকের কবিতাচর্চায় 'অতন্দ্র' পত্রিকা বড় ভূমিকা নিয়েছিল। 'অতন্দ্র' গোষ্ঠী নামে স্বতন্ত্র নামই হয়ে গিয়েছিল ওই পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্কিত কবিদের। এবং শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, শান্তনু ঘোষ, উদয়ন ঘোষেরা 'অতন্দ্র' পত্রিকা প্রকাশের পর আর কলকাতার বড় কাগজে লেখেননি। এবং প্রত্যেকেই ছিলেন অসম্ভব শক্তিমান। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দীপক মজুমদার ও আনন্দ বাগচি[৫৯] সম্পাদিত পত্রিকা 'কৃত্তিবাস'[৬০] কলকাতার পাঁচের দশকের কবিদের মুখপত্র ছিল। আর দ্বিতীয় 'কৃত্তিবাস' পুরস্কার পেয়েছিলেন বরাকপারের কবি শান্তনু ঘোষ। কিন্তু 'অতন্দ্র' প্রকাশের পর তিনি আর কলকাতার কোনো কাগজে লেখেননি, এতটাই বরাক-অন্ত-প্রাণ তিনি।

উদ্বাস্তু জীবন বরাকপারের কবিদের মধ্যে কতটা বাসা বেঁধেছিল তা একটি তথ্যেই পরিষ্কার। বরাকের শ্রেষ্ঠ কবি বলা হয় যাঁকে সেই শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর একটি কবিতাবইয়ের নামই উদ্বাস্তু। এবং বিখ্যাত কবিতাটির দুই পঙ্‌ক্তি এরকম—

'যে কেড়েছে বাস্তুভিটে সেই কেড়েছে ভয়

আকাশ জুড়ে লেখা আমার আত্মপরিচয়।' (উত্তর পূর্বের বাংলা কবিতা, পৃ. ৬৪)

তথ্যসূত্র

১. ২১শে ফেব্রুয়ারি — বাংলাভাষার স্বার্থে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় পুলিশের গুলিতে মারা যান ৪ ভাষাসেনানী। বর্তমানে এই দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে গোটা বিশ্বে।

২. গণভোট— শ্রীহট্ট ভারতে থাকবে না যাবে পূর্ব পাকিস্তানে— এনিয়ে গণভোট হয়েছিল ১৯৪৬ সালে।

৩. বড়বক্র— বরাক নদীর পূর্ব নাম।

৪. তৃতীয় ভুবন— কবি বিজিৎ ভট্টাচার্যের মতে, উত্তর-পূর্বের বাঙালিরা হলেন সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলাভাষার 'তৃতীয় ভুবন'। প্রথম দুই ভুবন যথাক্রমে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ।

৫. ভুবনেশ্বর বাচস্পতি— ডিমাসা রাজসভার কবি।

৬. 'মনসামঙ্গল'— বাংলা সাহিত্যের অন্যতম মঙ্গলকাব্য, যে কাব্যকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে শক্তিপদ ব্রহ্মচারী 'মনসামঙ্গল' নিয়ে কবিতা লেখেন।

৭. 'চণ্ডীমঙ্গল'— বাংলা সাহিত্যের অন্যতম মঙ্গল কাব্যের একটি।

৮. হেমাঙ্গ বিশ্বাস— বিখ্যাত গণসংগীত শিল্পী।

৯. 'সীমান্ত প্রহরী'— হেমাঙ্গ বিশ্বাসের একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'সীমান্তের প্রহরী'।

১০. ইরাবত সিং— মণিপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস তাঁর নামে কবিতা উৎসর্গ করেছিলেন।

১১. অশোকবিজয় রাহা— বরাকের প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের অন্যতম কবি। তাঁর লেখা কবিতা 'নাগা, রানি'।

১২. বুদ্ধদেব বসু— অন্যতম সাহিত্যিক, সমালোচক, শিক্ষাবিদ। ভারতে প্রথম তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ চালু করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

১৩. ডিহাং— অসমের অন্যতম একটি নদী।

১৪. ভানুমতীর মাঠ— অশোকবিজয় রাহার কাব্যগ্রন্থ।

১৫. মৃণালকান্তি দাশ— বরাকের অন্যতম কবি, পরে পরমানন্দ সরস্বতী নামে পরিচিত।

১৬. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ — ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

১৭. সুধীর সেন— বরাকের একজন অন্যতম কবি।

১৮. বিষ্ণু দে— তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য 'উর্বশী' ও 'আর্টেসিস'। প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে।

১৯. জীবনানন্দ— জীবনানন্দ দাস, 'বনলতা সেন' ও 'সাতটি তারার তিমির' অন্যতম কাব্যগ্রন্থ।

২০. শক্তিপদ ব্রহ্মচারী— বরাকের ৬০-এর দশকের একজন অন্যতম শক্তিশালী কবি, যাঁকে ছেড়ে বরাক উপত্যকার কবিতার কথা চিন্তাই করা যায় না।

২১. 'অতন্দ্র'— এটি একটি লিটল ম্যাগাজিন, যাকে কেন্দ্র করে বরাকে একটি কাব্য আন্দোলন হয়েছিল।

২২. বিমল চৌধুরী— বরাকের অন্যতম কবি।

২৩. উদয়ন ঘোষ— বরাকের অন্যতম শক্তিশালী কবি ও গদ্যকার।

২৪. বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য— বরাকের অন্যতম কবি এবং 'সাহিত্য' নামে একটি লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক।

২৫. রমা পুরকায়স্থ— শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক।

২৬. তপোধীর ভট্টাচার্য— কবি, প্রাবন্ধিক।
২৭. অনুরূপা বিশ্বাস— বরাকের একজন অন্যতম শক্তিশালী কবি।
২৮. উনিশে মে আয়ুষ্মান হও— অনুরূপা বিশ্বাসের কবিতা।
২৯. ছবি গুপ্তা— বরাকের অন্যতম মহিলা কবি।
৩০. ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ— মাতৃভাষা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি, যদিও আজীবন তিনি বাংলায় কবিতাচর্চা করছেন।
৩১. শান্তনু ঘোষ— তিনি বরাকের একজন অন্যতম কবি। কৃত্তিবাস পুরস্কার পেয়েছেন।
৩২. লেখাকর্মী— ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার লিটল ম্যাগাজিন।
৩৩. মনোতোষ চক্রবর্তী— বরাক পারের একজন কবি।
৩৪. স্বর্ণালী বিশ্বাস ভট্টাচার্য— বরাক দুহিতা, শিলঙের বধূ। শক্তিশালী কবি।
৩৫. করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য— বরাকের অন্যতম কবি।
৩৬. রামেন্দ্র দেশমুখ (১৯১৫-১৯৮৬) : বিভিন্ন সময়ে নানা পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'ধানখেত', 'বাহ্নিবাংলা', শতপুষ্প', শতপুষ্প', অমৃতের স্বাদ' প্রভৃতি তাঁর কাব্যসংকলন।
৩৭. অশোক বার্মা— অশোক বর্মা বরাকের একজন কবি।
৩৮. অর্ধেক আকাশ— অশোক বার্মার রচিত কাব্যগ্রন্থ 'অর্ধেক আকাশ'।
৩৯. অন্নপূর্ণা দেবী বার্মা— তিনি বরাকের অন্যতম একজন মহিলা কবি।
৪০. অমিতাভ দেব চৌধুরী— ৭০-এর দশকে বরাক উপত্যকার কাব্যভুবনের একজন অন্যতম কবি অমিতাভ দেব চৌধুরী।
৪১. শংকরজ্যোতি দেব— পেশায় সরকারি চিকিৎসক। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল— 'ঘুমের জানালা' এবং 'মহাপ্রস্থান'।
৪২. সৌমিত্র বৈশ্য— বরাকের একজন অন্যতম কবি।
৪৩. শেলী দাস চৌধুরী— দর্শনের শিক্ষক। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'অনন্ত পথরেখা'। 'মানবী' পত্রিকার অন্যতম সহযোগী।
৪৪. দীপঙ্কর নাথ—বরাকের আরেকজন উজ্জ্বল রোমান্টিক কবি।
৪৫. বনশ্রী বক্‌সি— বরাকের একজন কবি।
৪৬. কাব্যশ্রী বক্‌সি ভট্টাচার্য— কবি হিসেবে সুপরিচিত কাব্যশ্রীর দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সংকলন দুটি— 'সহজে ও মিলে মিছিলে' এবং 'পাগলি মেয়েটা'।
৪৭. স্মৃতি দত্ত— বরাকের একজন কবি।
৪৮. শর্মিলা দত্ত— বরাকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, ছোট পত্রিকা সম্পাদনা করতেন।
৪৯. বিশ্বরাজ ভট্টাচার্য— বরাকের তরুণ কবি।
৫০. অর্জুন চৌধুরী— ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র, কিন্তু বরাবর বাংলায় কবিতা চর্চা করে এসেছেন।
৫১. লীনা নাথ— বরাক উপত্যকার কবি, গল্পকার।
৫২. ভক্ত সিং— বরাকের একজন অন্যতম কবি।
৫৩. শতাব্দী— ছোট পত্রিকা।
৫৪. লুব্ধক— ছোট পত্রিকা।

৫৫. উদর্ক —ছোট পত্রিকা।

৫৬. দেবাশিস তরফদার— বরাক উপত্যকার অন্যতম প্রধান কবি-ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ— 'কথাসর্বস্ব', 'আপেলের বিকল্প' এবং 'ক্ষণপ্রভা'।

৫৭. তমোজিৎ সাহা— পেশা শিক্ষকতা। লিটল ম্যাগাজিন 'উজ্জ্বল পাণ্ডুলিপি'র সম্পাদক।

৫৮. পীযুষ রাউত— শিক্ষকতা থেকে অবসর নিয়েছেন। 'জন্ম রোমান্টিক' বলে তাঁর খ্যাতি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—'বিষণ্ণ উদ্যানে বৈশাখ', 'জন্ম দুয়োরি', 'নির্বাচিত কবিতা'।

৫৯. আনন্দ বাগচি— কবি, কৃত্তিবাস পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

৬০. কৃত্তিবাস— কৃত্তিবাস পত্রিকা। আনন্দ বাগচি, দীপক মজুমদার ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল গত শতকের পাঁচের দশকে।